Our Actions are our Future.

A **#ZeroHunger** world
by 2030 **is possible.**

কার্তিক ১৪২৫

কৃষিকথা

বিশেষ সংখ্যা

#WFD2018
www.fao.org/WFD

Working for #ZeroHunger

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ্রন্থাগার
তারিখ........
গাজীপুর-১৭০১

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৮

১৬ অক্টোবর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ্রন্থাগার
তারিখ
গাজীপুর-১৭০১

ধানভিত্তিক খামার ব্যবস্থা ও ব্রি'র ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণ কৌশল

ড. মো. শাহজাহান কবীর

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। এটি কৃষিনির্ভর দেশ হিসেবেও বিশ্বখ্যাত। গ্রাম প্রধান এ দেশ অন্তত ৬৮ হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত। এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ এবং শ্রমশক্তি ৬০ ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত। ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে গ্রামের উন্নয়নের কথা প্রথমে আসে। আর এ জন্য প্রয়োজন কৃষি উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা খাতের উন্নয়ন। এ দেশের অর্থনীতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষি। এখনো দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি এবং অধিকাংশ জনগণই জীবন-জীবিকা ও কর্মসংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। কাজেই কৃষিভিত্তিক শিল্পে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও প্রণোদনা আমাদের গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে যেমন কাঙ্ক্ষিত সাড়া জাগাতে পারে তেমনি জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-২০৩০ এর অন্যতম অভীষ্ট ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (জিএইচআই)-২০১৭ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা এবং অপুষ্টির মাত্রা ২০০০ সালে যা ছিল, তার চেয়ে ২৭ শতাংশ কমেছে। বিগত ২০১৭ সালে গড় বিশ্ব ক্ষুধা সূচক বা জিএইচআই স্কোর ২১.৮-এ নেমে এসেছে, যা ২০০০ সালে ছিল ২৯.৯%। একই জরিপ অনুযায়ী, ১১৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২৬ দশমিক ৫০ স্কোর নিয়ে ৮৮তম অবস্থানে আছে। গত ২০০০ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৩৭ দশমিক ৬ এবং ২০০৫ সালে তা ছিল ৩২ দশমিক ২। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) মতে, ক্ষুধা বলতে সাধারণত খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি এবং একজন লোকের স্বাভাবিক দৈহিক কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে পরিমাণ ক্যালরির দরকার, তার চেয়ে কম শক্তির জোগান দেয় এমন খাদ্যগ্রহণকে বোঝানো হয়। ভৌগোলিক এলাকাভেদে ক্যালরি গ্রহণের চাহিদার পার্থক্য হতে পারে। বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রধান উপাদান ভাত। অর্থাৎ মানুষের ক্যালরি চাহিদার সিংহভাগ আসে ভাত থেকে। দেশে জনপ্রতি চালের চাহিদা ১৪৫ কেজি/বছর। এছাড়া চালজাত বিবিধ রকমের খাদ্য উপাদানতো রয়েছেই। সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠনে ধানের ভূমিকা অপরিসীম।

> "হেক্টরপ্রতি ধানের গড় উৎপাদন ছিল ২ থেকে ২.৫ টন। ব্রি কর্তৃক নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তির কারণে তা ৩.৫ থেকে ৭.০ টন"

ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে ধানভিত্তিক খামার ব্যবস্থা দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে ধানভিত্তিক কৃষির বিকল্প নেই। বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ধান চাষে আধুনিক জাত এবং প্রযুক্তির বিস্তার ও ব্যবহার বাড়াতে পারলে আমাদের পক্ষেও বিদেশের তুলনায় দেশেই বেশি আয় করা সম্ভব। বীজ

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), গাজীপুর, মোবাইল : ০১৭১২২৮০০৮৩ ই-মেইল : dg@brri.gov.bd

সরবরাহ, সার-সেচে ভর্তুকিসহ বহুমুখী সরকারি প্রণোদনার কারণে এখন ধান চাষ আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় লাভজনক। দেশের বাজারে এখন এক মণ ধান বিক্রি হচ্ছে ৮০০ থেকে ১০০০ টাকায়। বর্তমানে এক কেজি মোটা চালের দাম ৪০-৫০ টাকা। সরু চাল বিক্রি হচ্ছে প্রকারভেদে কেজিপ্রতি ৬০ থেকে ১০০ টাকায়। ফলে ধান উৎপাদন এখন আর অলাভজনক নয়। আগে যেখানে হেক্টরপ্রতি ধানের গড় উৎপাদন ছিল ২ থেকে ২.৫ টন এখন নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তির কারণে তা ৩.৫ থেকে ৭.০ টনে দাঁড়িয়েছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে উদ্ভাবন করা হয়েছে উচ্চফলনশীল ধানের একাধিক জাত ও লাভজনক শস্যক্রম। যেমন- স্বল্প জীবনকালের খরা সহনশীল ব্রি ধান৫৬/খরা পরিহারকারী ব্রি ধান৫৭ এবং জিংক সমৃদ্ধ ব্রি ধান৬২ চাষ করে বৃষ্টিনির্ভর বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে বিনা সেচে ছোলা এবং মসুর চাষ করা যায় এমন একটি অধিক লাভজনক শস্যবিন্যাস উদ্ভাবন করেছেন ব্রি'র বিজ্ঞানীরা। এ শস্য বিন্যাস অবলম্বন করে জমির উৎপাদনশীলতা ১৮-৩২ শতাংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব (আরএফএস বিভাগ, ব্রি)। একইভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রি উদ্ভাবিত বিভিন্ন সময়োপযোগী উন্নত ধানের জাত চাষাবাদ করে কৃষক যেমন নিজে স্বাবলম্বী হতে পারে তেমনি ধানভিত্তিক কৃষি খামার ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করতে পারে।

অধিকন্তু বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এমন কিছু ধান জাত উদ্ভাবন করেছে যেগুলো সুগন্ধি, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, উন্নত পুষ্টি ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। এসব ধান জাতের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বিনিয়োগ করেও লাভজনক খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। যেমন- ব্রি উদ্ভাবিত বিআর৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৭, ব্রি ধান৬৩ ও ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৮০ প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন জাত। বিআর১৬, ব্রি ধান৪৬ ও ব্রি ধান৬৯ লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (লো-জিআই) গুণসম্পন্ন জাত, এসব জাতের চালের ভাত ডায়াবেটিক রোগীরা নিরাপদে খেতে পারেন। ব্রি উদ্ভাবিত জিংক সমৃদ্ধ চারটি ধানের জাত ব্রি ধান৬২, ব্রি ধান৬৪, ব্রি ধান৭২ এবং ব্রি ধান৭৪। এসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাতগুলোর ভোক্তা চাহিদা যেমন বেশি, বাজারমূল্যও অধিক। তাই ধানভিত্তিক খামার বিন্যাসে এ জাতগুলো উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসংস্থানের অন্যতম উপায় হতে পারে। এ খাতে বর্ধিত হারে বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগকৃত পুঁজি লাভসহ তুলে আনা সম্ভব।

মঙ্গা তাড়ানো ধান ও শস্যক্রম : উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় আশ্বিন-কার্তিক মাসে গ্রামাঞ্চলে কৃষকের ঘরে খাবার ও কৃষি শ্রমিকদের হাতে কাজ থাকে না। কাজ না থাকায় হাজার হাজার শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষ খেয়ে না খেয়ে দিন যাপন করে। এ সময় অভাবী মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় কাজের সন্ধানে ছুটে যায়। কেউ কেউ নিছক জীবন ধারণের জন্য আগাম শ্রম বিক্রিসহ বাড়ির হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, গাছপালা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এসব কথা চিন্তা করেই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট রংপুরে আশ্বিন-কার্তিক মাসে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষকদের মাঝে স্বল্পমেয়াদি ব্রি ধান৩৩, ব্রি ধান৬২-আগাম আলু-মুগ-ব্রি ধান৪৮ অধিক লাভজনক ধানভিত্তিক চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে তা কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেয়। আর এ ধান রোপণের মাত্র ১০০-১১০ দিনের মধ্যে পেকে যায়। যেখানে অন্যান্য জাতের ধান পাকতে সময় লাগে ১৪০-১৫০ দিন। অল্প সময়ে পাকে বলেই গ্রামাঞ্চলের চাষিরা এর নাম দিয়েছেন মঙ্গা তাড়ানো ধান। স্বল্পমেয়াদি এসব আগাম ধান কাটার পর ওই জমিতে আগাম আলু, ভুট্টা চাষাবাদ করা যায়। এতে মঙ্গা থেকে বাঁচা যায়। তেমনি আগাম আলু করে লাভবান হওয়া যায়। তাই বর্তমানে কৃষকরা এসব ধান চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। এ ছাড়া আশ্বিন-কার্তিক মাসে ফসল ঘরে উঠলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। কৃষকরা ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় এবং গো-খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়।

কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহারে বাড়বে কর্মসংস্থান : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত দেশের কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী ৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন করেছেন এবং শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষক পর্যায়ে

বিতরণ করছেন। চারা রোপণ, আগাছা নিধন থেকে ধান কাটা ও মাড়াই সব কিছুতেই লেগেছে প্রযুক্তির ছোঁয়া। সরকার ঘোষিত ৬০ শতাংশ ভর্তুকিতে কেনা একটি রাইস টান্সপ্লান্টার বা কম্বাইন হার্ভেস্টার স্ব-কর্মসংস্থানের অন্যতম উপায় হতে পারে। এছাড়া যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্তমানে কৃষকরা লাভবান হতে পারেন সেগুলোর মধ্যে আছে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, চারা রোপণ যন্ত্র বা ট্রান্সপ্লান্টার, রোটারি টিলার, ধান-গম কাটার যন্ত্র, ধান-গম মাড়াই যন্ত্র, কম্বাইন হারভেস্টার ও আগাছা দমন যন্ত্র বা উইডার ইত্যাদি। কৃষকরা এসব যন্ত্র নিজেরা ব্যবহারের পাশাপাশি ভাড়া দিয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতেও অন্যদের এসব সেবা প্রদান করে লাভবান হতে পারেন। সর্বোপরি, প্রতিটি কৃষক দেশের বীজ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের ফসল ও বীজ উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ কমাতে সক্ষম হবেন। কৃষকের হাতে নিজেদের উৎপাদিত উন্নত জাতের দেশি বীজ থাকবে ফলে বীজ বা প্রযুক্তির জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে না। বাংলাদেশের কৃষিতে একক বা ক্ষুদ্র কৃষকের স্থলে যৌথ বা সমবায়ভিত্তিক কৃষি খামার সৃষ্টি হবে। ফলে তারা যৌথভাবে একটি এলাকার কৃষির নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে এবং যার মালিকানার অংশীদার হবে তারা নিজেরা। তারা নিজেরাই নিজেদের ফসলের বীজ, উন্নত জাতের মাছের বীজ ও মাছ উৎপাদন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাকিটা বিক্রি করতে পারবে। তাদের নিজেদের আয় হতে প্রাপ্ত অর্থ আবার পোল্ট্রি, গবাদি বা দুগ্ধ সরবরাহকারী পশু খামারে বিনিয়োগের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পুষ্টি চাহিদা মেটাবে তেমনি অন্যদিকে বাড়তি উৎপাদন বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। কৃষকরা দেশে তৈরি পাওয়ার ট্রিলার, ধান মাড়াই যন্ত্র বা দানা ফসল মাড়াই যন্ত্র, আগাছা নাশক যন্ত্র, বীজবপন যন্ত্র, ফসলকাটা ও শ্রেণি বিন্যাসকরণ যন্ত্র, মূলজাতীয় ফসল মাটি থেকে উত্তোলন যন্ত্র, উন্নত প্রযুক্তির বিভিন্ন সেচ যন্ত্র, ফসল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষি শ্রমিকের চাহিদা ও খরচ দুটোই কমাতে সক্ষম হবে। একই সাথে দেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠবে যাতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গঠনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে।

বীজ ব্যবসায় বিনিয়োগে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ : ফসল উৎপাদনের প্রধান উপকরণ হলো ভালো বীজ। কথায় বলে, ভালো বীজে ভালো ফলন। ভালো বীজের অভাবে আমাদের কৃষকরা প্রায়শই প্রতারিত হন। এ পর্যন্ত মাত্র ৪৬ ভাগ চাষি মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে পারেন। বাকি ৫৪ ভাগ কৃষক অপেক্ষাকৃত নিম্ন মান সম্পন্ন বীজের ওপর নির্ভরশীল। মৌসুমভিত্তিক চিত্র হচ্ছে, আমনে শতকরা ২০-২৩ ভাগ, আউশে শতকরা ১৬ ভাগ, এবং বোরোতে ৮০ শতাংশ কৃষক মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করে থাকেন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ব্রি প্রতি বছর ১৫০ টনের অধিক ব্রিডার (প্রজনন) বীজ উৎপাদন এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। ব্রি থেকে ব্রিডার বীজ, ভিত্তি বীজ ও টিএলএস সংগ্রহে সামান্য পুঁজি বীজ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায় যা অভিবাসনের বিকল্প হতে পারে। এছাড়াও ধানভিত্তিক বিভিন্ন খাবার প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ (যেমন- চিড়া, মুড়ি, খই, রাইস কেক, চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি পিঠা-পুলি), কম ছাঁটা বা ঢেঁকি ছাঁটা চাল (অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন), বিভিন্ন মৎস্য ও পশু খাদ্য প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সামান্য পুঁজি বীজ ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা যায়। অভিবাসন ব্যয়ের সিকিভাগও যদি কৃষক পর্যায়ে উন্নত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ, সার, সেচ সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং উন্নত পুষ্টি ও ঔষধি গুণ সম্পন্ন ধান উৎপাদন, ধানের চাল থেকে খাবার প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা যায় তাহলে কৃষক পর্যায়ে যেমন ঝুঁকিমুক্ত ও টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তেমনি ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ❑

গ্রন্থাগার
তারিখ.....